অনুরণন

Anuranan: An International Peer-reviewed Journal of Humanities and Social Sciences

ISSN 2347-8055
Vol. 11 - 2023

শ্রীঅরবিন্দ এবং স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্বচৈতন্যের ধারণার তুলনামূলক পর্যালোচনা

সৃজনী রায়
সহকারী অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ
ড.বি.আর. আম্বেদকার শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়

Anuranan: An International Peer-reviewed Journal of Humanities and Social Sciences
Vol. 11 originally published online November 2023

The online version of this article can be found at: http://www.arunananjournal.org/

Published by
অনুরণন
www.anurananjournal.org

Additional services and information for
Anuranan: An International Peer-reviewed Journal of Humanities and Social Sciences can be found at:

About the Journal: http://www.anurananjournal.org/about-us/
Editorial Board: http://www.anurananjournal.org/editorial-board/
Submission Guidelines: http://www.anurananjournal.org/submission-guidelines/
Contact: http://www.anurananjournal.org/contact-us/

© 2023 Anuranan: An International Peer-reviewed Journal of Humanities and Social Sciences

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

Vol.11 : 2023 | **ISSN 2347-8055**

শ্রীঅরবিন্দ এবং স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্বচৈতন্যের ধারণার তুলনামূলক পর্যালোচনা

সৃজনী রায়
সহকারী অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ, ড.বি.আর. আম্বেদকার শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়

সংক্ষিপ্তসার

শ্রী অরবিন্দের বিশ্বচৈতন্যের ধারণার নিছক আলোচনা এই পত্রের উদ্দেশ্য নয়, গবেষণাপত্রটি কখনোই এই দাবি করে না যে বিশ্বচৈতন্যের ধারণার সৃষ্টিকর্তা একমাত্র শ্রী অরবিন্দ। শ্রী অরবিন্দের সমসাময়িক আরো অনেক মহাপুরুষের কণ্ঠেই বিশ্বচৈতন্যের ধারণা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অনুরণিত হয়েছে। নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করলে যে দুজন মহাপুরুষের নাম স্মরণ করতে হয় তাঁরা হলেন স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।এই দুই মহান ব্যক্তির দর্শনে বিশ্বচেতনা যেভাবে উপলব্ধ হয়েছিল, শ্রী অরবিন্দও কি সেই একই অর্থে বিশ্বচেতনাকে উপলব্ধি করেছিলেন? শ্রী অরবিন্দের বিশ্বচৈতন্যের ধারণা যদি এই দুই মহান ব্যক্তির চিন্তন কাঠামো থেকে ভিন্ন হয় তাহলে কোথায় তাঁর ধারণাটি আলাদা?- এইসব প্রশ্ন উত্থাপন-পূর্বক সেগুলির যথাযথ উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে বর্তমান পত্রে। বিশ্বচেতনার ধারাণায় এই দুই মহান ব্যাক্তিত্বের চিন্তনে অনেক খানি গভীর সম্পর্ক থাকলেও শ্রী অরবিন্দের চিন্তন, স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তন থেকে অনেকখানি স্বতন্ত্র। তাঁর চিন্তনের গভীরতার তল খুঁজে পাওয়া অত সহজ নয়। স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তনে বেদান্তের ব্যাবহারিক দিকটি প্রাধান্য পাওয়ায় সাধারণ মানুষের হৃদয় স্পর্শ করতে স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তন অনেক বেশী বাস্তবসম্মত বলে মনে করা যেতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দের মনে করেন- সকল জীবকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করলে ব্যাক্তিমন বিশ্বমনে রূপান্তরিত হবে,তখন জগতের ব্রহ্মস্বরূপতা তথা আত্মসাক্ষাৎকার সম্ভব হবে। শ্রী অরবিন্দ, স্বামী বিবেকানন্দের মত সকল জীবকে শুধুমাত্র ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করেননি, তিনি জড় ও চেতনাকে উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু তাঁর দর্শন এই কারণে স্বতন্ত্র, যে তিনি চেতনার বিকাশের সর্বোচ্চ শিখরে উত্তীর্ণ হয়ে ,অতিমানস চেতনাকে মর্ত্যধামে অবতরণ ঘটিয়ে বিবর্তনের ধারায় দিব্যমানের আবির্ভাবের স্বপ্ন দেখেছিলেন।একইসঙ্গে সর্বোচ্চ চেতনা তথা অতিমানস চেতনাকে জড়ের স্তরে নামিয়ে এনে জড়সত্তার উত্তরণ ঘটাতে চেয়েছেন অতিমানস চেতনায়, আর এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য তিনি যে মন ও অতিমনের মধ্যবর্তী সেতুর কল্পনা করেছেন তাই তাঁর দর্শনে বিশ্বচেতনার স্থান পেয়েছে।

ভূমিকাঃ

এই পত্রের আলোচ্য বিষয় শ্রী অরবিন্দের "বিশ্বচৈতন্যের" ধারণা। 'বিশ্বচৈতন্য' বলতে শ্রী অরবিন্দ ঠিক কী বুঝিয়েছেন, কেন এই বিশ্বচৈতন্যের ধারণা তাঁর দর্শনে এতখানি গুরুত্বপূর্ণ; বিশ্বচৈতন্য ও বিশ্বাতীত চৈতন্যের পারস্পরিক সম্পর্কটি ঠিক কি; সর্বোপরি শ্রী অরবিন্দের জীবনদর্শনের সঙ্গে এই বিশ্বচৈতন্যের

ধারণার সম্পর্কই বা কী- সে বিষয়ে সম্যক অবগতির জন্য শ্রী অরবিন্দের দার্শনিক ভাবনার যথাযথ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ আবশ্যক।

একজন শিল্পী যখন ছবি আঁকেন তখন তাঁর ছবিতে ফুটে ওঠে নানা বর্ণের সমাবেশ এবং এই নানা বর্ণের সমাবেশে যে অসাধারণ চিত্রটি প্রকাশিত হয় সেখানে বর্ণের সঙ্গে বর্ণের বিরোধ দেখা বুদ্ধিজীবী মানুষের কাম্য নয়। প্রজ্ঞানময় মানুষ দেখে বিভিন্ন বর্ণের বৈচিত্র্যে ফুটে ওঠা এক অসাধারণ শিল্পকর্ম। শ্রী অরবিন্দ ছিলেন এমনই এক প্রজ্ঞানময় ব্যক্তিত্ব, যিনি তাঁর দর্শন রচনার শুরুতে প্রথমেই পূর্বস্বীকৃত দুটি বিপরীত ধর্মী সত্যের মধ্যে বিরোধ না দেখে পারস্পরিক সমন্বয়ের ভাব দেখলেন। এই পূর্বস্বীকৃত সত্য দুটির একটি হল জড় (Matter) এবং অন্যটি হল মন (Mind)।জগতের মূল সত্য জড়; কারণ জড় আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হয়। আর জড় থেকেই জগৎ ও জীবনের সূত্রপাত।

অপর একটি মত হল জড়ের জগৎ মিথ্যা বা ভ্রম। বিশ্বের মূল তত্ত্ব চিৎ বা চেতনা।জড় থেকে চিৎ পর্যন্ত ক্রমিক উত্তরণ বিশ্বপ্রকৃতির স্বাভাবিক প্রবৃত্তি।উত্তরণের প্রতি পর্বে জড়ধর্ম ক্রমশ হ্রাস প্রাপ্ত হবে এবং আরোহের ক্রমে বিপরীত ধর্মের বৃদ্ধি সংযোজিত হবে। শ্রী অরবিন্দের দর্শনে বলা হয় 'রূপ' ধাতুই এই চিৎ শক্তির আত্মবিভূতি-তার একটি কোটি জড় আরেক কোটি চিৎ'। ১

শ্রী অরবিন্দের বিশ্বচৈতন্যের ধারণাটি সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে (Supramental consciousness) বিশ্বাতীত চৈতন্য বা অতিমানস চেতনার ধারণা তা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই অতিমানস চেতনার ধারণাও তিনি বেদের থেকেই গ্রহণ করেছেন। বৈদিক ঋতচিতের ধারণা শ্রী অরবিন্দের 'দ্যা লাইফ ডিভাইন' গ্রন্থে 'অতিমানস' আখ্যা লাভ করেছে। প্রাকৃত মনের একটা উন্নত সংস্করণ হল অতিমানস। অতিমানসের শক্তি বা জ্যোতিকে ধারণ করবার সামর্থ্য উত্তর মন, প্রভাস মন বা বোধিমনের নেই। এই শক্তিকে ধারণ করবার ক্ষমতা আছে একমাত্র অধিমন বা বিশ্বচেতনার।

উপরিউক্ত বিশ্লেষণ থেকে এটা স্পষ্ট যে, বিশ্বচেতনা শ্রী অরবিন্দের দর্শনে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে। দুটি পৃথক অবস্থিতির মধ্যে যা সংযোগ ঘটায় তাকে আমরা সেতু বলে থাকি। বিশ্বচেতনা শ্রী অরবিন্দের দর্শনে এমনই একটি সেতু, যেখানে একদিকে জড় ও চৈতন্যের মধ্যে সংযোগ ঘটেছে, অপরদিকে এর মাধ্যমে চেতনার উত্তরণ ঘটেছে অতিমানস লোকে; আবার অতিমানস লোকের জড়ের স্তরে অবতরণ ঘটেছে।আরো একটি কারণে বিশ্বচেতনা গুরুত্বপূর্ণ সেটি হল, মনের উত্তরণের সর্বোচ্চ স্তর এই বিশ্বচেতনা। বিশ্বচেতনার পরে যে বিশ্বাতীত চেতনা বা অতিমানসের স্তর সেখানে মনের ভূমিকা থেকে অতিমানস লোকের সচ্চিদানন্দময়ী শক্তির ভূমিকা বেশি। তাই মনের যতটুকু ক্রিয়া বা সামর্থ তাকে বিচার-বিশ্লেষণ করে চরম পর্যায়ে পৌঁছে নিয়ে যেতে পারে যে স্তর, সেটিই বিশ্বচেতনার স্তর।

শ্রী অরবিন্দ অতিমানসের দুটি প্রধান বিশেষত্ব স্বীকার করেছেন ।অতিমানস একদিক থেকে মনের উন্নত স্তর এবং দ্বিতীয়ত মনের অতীত। ব্যক্তি মনের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত এক অনন্ত মন শ্রী অরবিন্দের

দর্শনে অতিমানস।অতিমানস চেতনা নিম্নলোক এবং ঊর্ধ্ব লোকের মধ্যবর্তী সেতুস্বরূপ মধ্যভুমি।ইতিপূর্বে আমরা শ্রী অরবিন্দের দর্শনের সপ্ততন্ত্রীর আলোচনা করেছি। এক্ষেত্রে অতিমানসের অবস্থান বুঝতে গেলে প্রকৃতির মধ্যে পরম সত্তার যে দ্বিমুখী গতি ক্রিয়া করছে তাকে বুঝতে হবে।শ্রী অরবিন্দের মতে জড়ের স্তরে জড়ের মধ্যে যদি প্রাণশক্তি সুপ্ত অবস্থায় না থাকতো তাহলে জড় থেকে প্রাণের উদ্ভব হওয়া সম্ভব হতো না। আর প্রাণের মধ্যে মনের শক্তি যদি সুপ্ত অবস্থায় না থাকতো তাহলে প্রাণ থেকেও মনের উদ্ভব হতো না। কাজেই যাকে আমরা জড় বলে মনে করছি তা শুধুই জড় নয়, তার মধ্যে সুপ্ত হয়ে আছে পরম সত্তার সচ্চিদানন্দময়ী শক্তি। ২

কিন্তু কি উপায় এই শক্তি জড়ের মধ্যে এল?এর উত্তর দিতে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দ পরমসত্তার দ্বিমুখী গতি স্বীকার করেছেন। একটি হলো আরোহণ-মুখী এবং অপরটি হল অবরোহন-মুখী।অবরোহন-মুখী গতিতে পরমসত্তা আপন চিৎ শক্তিকে সংকুচিত করতে করতে ধাপে ধাপে নেমে এসে অবশেষে জড়ের রূপ গ্রহণ করে। তার অবরোহন-মুখী ভাবগুলি যথাক্রমে সপ্ততন্ত্রের বিভিন্ন তন্ত্র। আর আরোহণ মুখী প্রক্রিয়ায় জড় থেকে চেতনা ক্রমে ক্রমে বিকশিত হতে হতে ধাপে ধাপে এগিয়ে যায় পরমসত্তার দিকে । আরোহণমুখী বা বিবর্তন প্রক্রিয়ার ধাপগুলি অবরোহন মুখী প্রক্রিয়ার ঠিক বিপরীত। যেমন জড়, প্রাণ চৈত্যপুরুষ, মন ,অতিমানস, আনন্দ,চিৎশক্তি ও সৎ। বিবর্তন প্রক্রিয়াতে জড় থেকে প্রাণ ও প্রাণ থেকে চৈত্যপুরুষ ও মনের বিকাশ পর্যন্ত ব্যবহারিক জগতের বিবেচ্য বিষয় ।জড় থেকে মন পর্যন্ত প্রথম চারটি ধাপকে বলে নিম্নলোক, আর এর পরবর্তী অতিমানস থেকে সৎ পর্যন্ত চারটি ধাপ ঊর্ধলোক। নিম্নলোক আর উর্ধলোকের মাঝের প্রহরী হল অতিমানস লোক। নিম্নলোক পর্যন্ত চেতনার বিকাশ অতি সামান্যই হতে পারে ।এর পরের ধাপে এগিয়ে যেতে পারলে উর্ধ্বলোক থেকে নেমে আসবে চেতনার প্রবাহ । যেদিন বিবর্তনকারী প্রকৃতি মনের স্তর অতিক্রম করে আর এক ধাপ এগিয়ে ঊর্ধ্বলোকের অতিমানসস্তরে আরোহন করবে সেই দিনই হবে নতুন যুগের সূচনা। পৃথিবীর বুকে জন্ম নেবে অতি-মানব বা দিব্য-মানব ।নিম্নলোক ও ঊর্ধলোকের মাঝখানে আছে একটি যবনিকা, যার একদিকে আছে মন ও অপরদিকে আছে অতিমানস। সাধনার দ্বারা এই যবনিকা উত্তোলন করতে পারলে উর্ধ্বলোকের জ্যোতি মানুষের নিম্নতর সত্তার মধ্যে প্রবেশ করবে এবং নিম্নতর সত্তাকে ঊর্ধ্বলোকে আরোহন করিয়ে নিয়ে যাবে অতিমানস স্তরে ।এই অতিমানস মনের মধ্যে অবতরণ করলে বা মন অতিমানসে রূপান্তরিত হলে কেবল যে অনন্ত চিৎশক্তি প্রকাশিত হবে তাই নয় , সমস্ত মন- প্রাণ -দেহ হবে রূপান্তরিত। কিন্তু কিভাবে অতিমানস শক্তি নিম্নলোকের আধারে অবতরণ করবে? মাঝখানের যবনিকার উত্তোলনই বা কিভাবে হবে?

এইসব প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলা যেতে পারে শ্রী অরবিন্দের দর্শন অধ্যয়ণ করলে মনে হয় তিনি যেন বলতে চেয়েছেন সচ্চিদানন্দময়ী মহাশক্তির কৃপা ছাড়া তা সম্ভব হবে না ।চিন্ময়ীমহাশক্তি কৃপা করে যবনিকা উত্তোলন করে দিলে তবেই অতিমানসের জ্যোতি নিম্নলোকের আধারে প্রবেশ করবে। আর এই দিব্যশক্তির কৃপা পাবার জন্য সাধকের থাকতে হবে তীব্র আস্পৃহা বা ব্যাকুলতা ।এটি ছাড়াও

> অপর যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো কায়া সিদ্ধি বা শারীরিক সিদ্ধি,খেলাধুলা, ব্যায়াম আসন, প্রাণায়াম যার অন্তর্ভুক্ত ।আমাদের দেহ, মন ,প্রাণ ,আত্মাকে, এক কথায় সমস্ত সত্তাকে সম্মিলিত করে ধরা চাই মাতৃশক্তির কাছে তবে মাতৃশক্তি আধারে অবতরণ করে সমগ্র সত্তাকে করবে রূপান্তরিত। এইভাবে মাতৃশক্তিকে আধারে অবতরণ করে আনার জন্য ও চেতনাকে ঊর্ধ্বলোকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রয়োজন পূর্ণযোগ অনুশীলন। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে, শ্রী অরবিন্দ তাঁর পূর্ণযোগের মাধ্যমে অতিমানস লোকে আরোহণ এবং অতিমানস শক্তিকে দেহে, মনে, প্রাণে সঞ্চারিত করার উপায় নির্দেশ করেছেন। অর্থাৎ শ্রী অরবিন্দের যোগের এটাই লক্ষ্য ছিল ক্ষেত্র প্রস্তুত করে তোলা যাতে করে মাতৃশক্তি যখন নিম্নলোকের আধারে প্রবেশ করবে, তখন আধার যেন অজ্ঞানতা অহমিকা কাটিয়ে সেই শক্তিকে গ্রহণ ও ধারণ করবার জন্য প্রস্তুত থাকে। ৩

অতিমানস লোক সম্পর্কে কোন ধারণা করা মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব, কারণ মানুষ মনের স্তরের জীব, অর্থাৎ শ্রী অরবিন্দ মনের যে বিভিন্ন প্রকার স্তরের উল্লেখ করেছেন মানুষ তার মধ্যে সবথেকে নিম্নস্তরে অবস্থান করে। মনের স্তর অতিক্রম করে ক্রমে ক্রমে উত্তর-মানস, প্রভাস-মানস, বোধি-মানস ও অধিমানস প্রভৃতি বিভিন্ন স্তর পার করে তবেই পৌঁছানো যায় অতিমানস স্তরে। এই বিষয়টিকে বুঝতে গেলে মনের স্তর গুলির বিশেষত্ব কি তা আগে জানতে হবে।ঋষি অরবিন্দের দর্শনের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল Mind (মন বা প্রাকৃত মনের) বিভিন্ন স্তরবিন্যাস স্বীকার করা। এগুলি হল যথাক্রমে-Higher mind(উচ্চতর মন বা উত্তর-মানস) ,Ilumind mind (প্রভাস মন বা প্রভাস-মানস), Intuitive mind(বোধিমন বা বোধি-মানস) এবং Overmind(অধিমন বা অধিমানস)। বিশ্বচৈতন্যের স্বরূপ উপলব্ধিতে মনের এই স্তর গুলির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

> উত্তর মন, প্রভাস মন ও বোধিমনের পরবর্তী স্তরে চেতনার উত্তরণ ঘটে অধিমানস পর্যায়ে। এই অধিমানসের স্তরের অপর নাম বিশ্বচেতনার জাগরণের স্তর। এটি আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। ইতিপূর্বে বিশ্বচৈতন্যের যে আলোচনা করা হয়েছে তা থেকে বোঝা যায় এটিই কেন আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। এক্ষণে দেখা যাক মনের এই স্তরের এই বৈশিষ্ট্য কি?- সে সম্পর্কে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হল।এই স্তরে বিশ্বচেতনার শক্তি প্রকটভাবে প্রকাশিত হয়। আর তার ফলেই অতিমানসে আরোহণ বা অতিমানসের অবতরণ সম্ভব হয়। এই স্তরে অহম্ বোধ ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে বিশ্বাত্মার উপলব্ধি হয়। এই স্তরে থাকে বিশ্বসত্তা, বিশ্বচেতনা, বিশ্বশক্তির লীলা ও বিপুল আনন্দ। এই স্তরে ব্যক্তি নিজের সত্তায় সমগ্র বিশ্বকে এবং সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে নিজের সত্তাকে অনুভব করে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই ব্যক্তিসত্তা কিন্তু অহং সত্তা নয়। আত্মচেতনার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তি নিজেকে বিশ্বসত্তায় পরিণত করে। ৪

অধিমানসে রূপান্তর রূপান্তরের বা মানব মনের আরোহণের চূড়ান্ত পর্যায়। উচ্চতর মন, প্রভাস মন ও বোধিমন- এই সকল স্তরেরই সমৃদ্ধি ঘটে এই অধিমানসের স্তরে। মানবমন নিজের চেষ্টায় এই স্তর পর্যন্তই পৌঁছাতে পারে। উপনিষদের ভাষায় অধিমানস আসলে অতিমানসেরই প্রতিনিধি। অতিমানসের অখণ্ড জ্ঞানকে খণ্ডিতভাবে বিচ্ছুরিত করা অধিমানসের কাজ। একের বহু হওয়াই সৃষ্টির তাৎপর্য ।অধিমানসে অবিদ্যার যে বীজ নিহিত আছে, তার বিশেষত্ব হলো সচেতন কিছু একটার মধ্যে আবিষ্ট হওয়া। এখানে ‘এক’ যেহেতু ‘বহু’ হয়, তাই এই স্তর

সীমারেখার স্তর। আর অবিদ্যার ক্রিয়াই হল সীমারেখা টানা। প্রাকৃত মন এবং অধিমনের পার্থক্য টানতে গিয়ে বলা যায় যে প্রাকৃত মনে যে ভেদ জ্ঞানের সৃষ্টি হয় তাতে অভেদ জ্ঞান আচ্ছন্ন বা লুপ্ত থাকে কিন্তু অধিমনে যে ভেদজ্ঞানের সৃষ্টি হয় তাতে অভেদ জ্ঞান পূর্ণ জাগ্রত থাকে। এক্ষেত্রে অধিমানসের ক্রিয়া অতিমানসের শক্তিতে প্রকাশিত হয় বলে অধিমানসের মধ্যে ভেদ আর অভেদে কোনো বিরোধ নেই। অর্থাৎ এই স্তরে ভেদ ও অভেদ অদ্বৈতবোধে জড়িত।

> এই স্তরে বিশ্বচেতনা ও শক্তির প্রসার এতটাই বেশি যে অতিমানসের দিব্যজ্ঞান ও দিব্য আনন্দ এখানে প্রকট হয়। মনের থেকে উৎকৃষ্ট স্তর হলেও মনে যে বিভিন্ন প্রকার দ্বন্দ্ব ও বিভেদ সৃষ্টি হয় তা এই স্তরেই সমগ্রতার প্রয়োজনে পরস্পর পরস্পরের পরিপূরকরূপে সহাবস্থান করে। আবার এই স্তরেই অখণ্ড বিশ্বচেতনার জ্ঞান হয়। তাই বলা যায় অধিমানসের স্তর একদিকে খণ্ডতা ও অখণ্ডতার আধার, আবার অপরদিকে অতিমানস ও বিশ্বের সংযোগস্থল। ৫
>
> অধিমানসের স্তর অতিক্রম করলে সাধক পৌঁছে যায় মনের ক্ষেত্রের বাইরে অতিমানস লোকে। এখানে চেতনা হল পরা-চেতনা। জ্ঞান হল স্বতঃস্ফূর্ত, অখণ্ড বিশ্বাতীত সত্তার জ্ঞান । এই স্তরেই বিজ্ঞানময় পুরুষ বা দিব্যমানবের আবির্ভাব।এই স্তরেই অনুভব করা যায় সমস্ত জীবের সঙ্গে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে একাত্মতা ।এই লোক শক্তিময়, জ্যোতির্ময় ,বিজ্ঞানময়। এটি দিব্য জীবন। এই অতিমানস শক্তি,জ্যোতি, বিজ্ঞানকে নামিয়ে এনে নিম্নলোকের রূপান্তর সাধিত হলে বিবর্তন প্রক্রিয়া আর এক ধাপ এগিয়ে যাবে। তখন জগতের সামগ্রিক কল্যাণ সাধিত হবে।
>
> যখনই ব্যাক্তি বিশ্বচেতনায় বাস করবে -বিশ্বের মধ্যে সকলকিছু সম্বন্ধে ব্যাক্তির অনুভূতি ও মূল্যায়নের আমূল পরিবর্তন হবে। বিশ্বচেতনায় প্রবেশ করলে ব্যাক্তি সেই সমগ্রদর্শনের অংশীদার হবে আর সবকিছুকে দেখবে অনন্ত ও একম্ র মূল্যে। সুখ-দুঃখ পরিবর্তিত হবে দিব্য আনন্দে। মন, প্রাণ, দেহের সসীমতা ব্যাক্তিকে সীমিত করতে পারে না, কারণ ব্যাক্তি তখন বাস করে চিৎপুরুষের অনন্তের মধ্যে। সবকিছু যেন তখন সচ্চিদানন্দের পরমসত্তা, চিৎ-শক্তি ও আনন্দের বিভিন্ন মাত্রা যিনি বিশ্বের মধ্যে নিজেকে আবৃত ও প্রকাশ করেছেন। ব্যাক্তি মুক্ত হয় সকল প্রকার বিদ্বেষপূর্ণ ও পরস্পর বিরোধী ভাবনা থেকে, কারণ সবকিছুতে ব্যাক্তি নিজেদের অন্তঃপুরুষকে দেখে, ভগবানকে খুঁজে পায়। এইভাবে সবকিছুই ব্যাক্তি দেখি তাদের দিব্যমূল্য ও দিব্যউদ্দেশ্য দিয়ে। এইভাবে ব্যাক্তি লাভ করে সম্পূর্ণ মুক্তি ও অনন্ত সমত্ব।এটিই শাশ্বত, পূর্ণতা। ৬

এবার দেখা যাক শ্রী অরবিন্দের বিশ্বচেতনার আলোচনার সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক ঠিক কী? দর্শনের ইতিহাসে স্বামী বিবেকানন্দের পরিচিতি যুগদিশারী ও ভবিষ্যত ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে। সর্বোপরি তৎকালীন জগৎ তথা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তখন স্বামী বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক চেতনার সাক্ষী বহন করে চলেছে। তাই সমসাময়িক একটি ধারণা প্রসঙ্গে দুই মনীষীর চিন্তনের সাযুজ্য কি তা দেখে নেওয়া আবশ্যক।

স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে শ্রী অরবিন্দের চিন্তাভাবনা ছিল- একজন অশিক্ষিত হিন্দুযোগী, যিনি আত্মদীপ্ত, ভাবোন্মাদ, মিষ্টিক যাঁর মধ্যে বিদেশী শিক্ষার সামান্যতম স্পর্শ বা চিহ্ন ছিল না, কলকাতার সর্বোত্তম শিক্ষিত যুবকেরাও যখন তাঁর চরণতলে প্রণত হল ,তখন যুদ্ধজয় হয়ে গিয়েছে। বিবেকানন্দের সম্বন্ধে তাঁর গুরু(শ্রী রামকৃষ্ণদেব) বলেছিলেন, "তিনি জগৎকে দুহাতে ধরে বদলে দেবার মত শক্তিমান পুরুষ, সেই বিবেকানন্দের যাত্রা জগতের সামনে প্রথম প্রকাশ্যে দেখিয়ে দিল, ভারত জেগেছে—শুধু বেঁচে থাকার জন্য নয়—জয় করবার জন্য সে জেগেছে"। ৭

শ্রী অরবিন্দ নিজে যাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ, এহেন মণীষীকে উপেক্ষা করে তৎকালীন একটি বিশেষ প্রত্যয়ের আলোচনা করা সম্ভব ছিল না। তাই এই পত্রে স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তনের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

'চৈতন্যলাভ' যদি অধ্যাত্মজীবনের চরম লক্ষ্য হয়, তাহলে চেতনার আলোচনা স্বামী বিবেকানন্দের দর্শনেও উপেক্ষিত হতে পারে না। তাঁর মতে চৈতন্যকে চৈতন্যরূপে প্রত্যক্ষ করাই ধর্ম। কারণ প্রকৃত আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি চৈতন্যকে চৈতন্যরূপেই প্রত্যক্ষ করেন ,জড়রূপে নয়। তিনি এটাও মনে করতেন -চৈতন্যই প্রকৃতিকে গতিশীল করে, চৈতন্যই সত্যবস্তু।এই চৈতন্যকে তিনি এক, অপরিনামী ও শাশ্বত বলে মনে করেন। চৈতন্য ও জড় প্রকৃতপক্ষে এক তাঁর দর্শনে। কিন্তু চৈতন্য স্বস্বরূপে কখনোই জড় নয় ।একইভাবে জড় কখনো জড়সত্তারূপে চৈতন্য হতে পারে না। ৮

স্বামীজী বলেন সাংখ্যদর্শনে জগতে প্রকৃতির প্রথম বিকাশকে 'মহৎ' বলা হয় ।এই 'মহৎ' কেই তিনি সমষ্টিবুদ্ধি বলেছেন। প্রকৃতির প্রথম বিকাশ এই বুদ্ধি। একে তিনি অহংজ্ঞান বলেননি। কারণ তিনি মনে করেন অহংজ্ঞান এই বুদ্ধিতত্বের অংশমাত্র, বুদ্ধিতত্ত্ব সার্বজনীন তত্ত্ব ,চেতনা ,অবচেতনা ,অতিচেতনা -এগুলি সবই এই মহত্তত্ত্বের অন্তর্গত। এখন দেখা যাক স্বামীজীর দর্শনে এই তিনটি অবস্থা কি? অবচেতন হল জ্ঞানের নিম্নভূমি ,পশুদের মধ্যে যে সহজতাজ্ঞান থাকে তাকে এই ভূমির অন্তর্গত বলা যেতে পারে। এই জ্ঞানের পরিধি সীমিত কিন্তু এই জ্ঞান অভ্রান্ত।এর পরের অপেক্ষাকৃত উচ্চতর অবস্থা হল চেতন স্তর, এখানে আছে সাধারণ জ্ঞান ।সাধারণ জ্ঞান বলে এটি ভ্রান্তিপূর্ণ।

এর থেকেও মনের আর এক উচ্চতর অবস্থা আছে ,যাকে বলে অতিচেতন অবস্থা। স্বামীজীর মতে একমাত্র ঐ অবস্থার অধিকারী যোগীরাই হতে পারে। স্বামীজীর মতে এটিই চেতনার সর্বোচ্চস্তর ।এই স্তর সহজাতজ্ঞানের ন্যায় অভ্রান্ত, আবার যুক্তিবিচার অপেক্ষা এর অধিক প্রসার। তিনি বলেছেন যেন মানুষ ভেতর মহৎই- অবচেতন, চেতন ও অতিচেতনভূমি- জ্ঞানের এই তিন অবস্থায় সমগ্রভাবে প্রকাশিত হচ্ছে, সেরকম এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডেও এই সর্বব্যাপী বুদ্ধিতত্ত্ব বা মহৎ-সহজাতজ্ঞান, যুক্তিবিচারজনিত জ্ঞান ও বিচারাতীত জ্ঞান-- এই ত্রিবিধ ভাবে অবস্থিত। ৯

স্বামীজি বলতে চেয়েছেন স্বজ্ঞার সাহায্যে বিচার করলে চেতনা আর অনুমানের বিষয় থাকে না। তখন আমরা স্ব-চেতনার দীপ্তির মধ্যেই বিরাজ করি ।এই চেতনের কোন ছেদ নেই। আন্তরিক ও বাহ্যিক অনুভূতির বস্তুগুলির সঙ্গে যে ব্যক্তি জ্ঞানের সংযোগ ঘটাতে সক্ষম হন ,তিনি তখন এক অনন্ত অনির্বাচনীয়, অনড় অক্ষয়চৈতন্য লাভ

করেন। সকল সত্তার ধারক এই অনন্ত চৈতন্য। এই চেতনার স্বরূপ নিত্য মুক্ত—জন্মহীন, মৃত্যুহীন। কোন অবস্থাতেই তাঁর পরিবর্তন নেই। এই চেতনা স্থান, কাল অথবা কার্যকারণ তত্ত্ব দ্বারা সীমিত নয়। তিনি সর্বোত্তম সনাতন সত্য, তিনিই ব্রহ্ম। সচেতন মানবসন্তানরূপে ব্যাক্তি সেই সত্যেরই অংশবিশেষ।

যখন জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়, তখন চেতনা বদ্ধ হয়ে পড়ে। চেতনার প্রকৃত সত্তা অর্থাৎ ব্রহ্ম নিস্কলঙ্ক এবং নিত্য, বিকারহীন। দৈনিক জীবনে চৈতন্যের সত্যকার রূপকে উপলব্ধি করা কঠিন। স্বামীজীর মতে চৈতন্যকে যখন বৃত্তিসমূহের সঙ্গে এক করে ফেলা হয়, তখনই মনে হয়, চৈতন্য ক্ষণস্থায়ী, বিচ্ছিন্ন এবং পরিবর্তনশীল। তিনি বলেন—সুষুপ্তি অবস্থায় চেতনা যে স্তরে থাকে তা জাগ্রত অথবা স্বপ্নাবাস্থার থেকে পৃথক। অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন জাগ্রত অথবা স্বপ্নবস্থার মতো সুষুপ্তি অবস্থায় অনুভূতি এই বহুমাত্রিক বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থেকে আসে না, আসে ঘনীভূত এক অবধারণা থেকে।

চেতনার সর্বোত্তম অবস্থায় তখনই পৌঁছানো যায় যখন চৈতন্যকে সকল উপলব্ধির নিত্য, অনন্ত ধারকরূপে এবং সকল বস্তুসম্পর্করহিত রূপে উপলব্ধি করা যায় ।ইনিই আত্মা, প্রকৃতি সত্তা।আত্মাই ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম সাধনার চরম লক্ষ্য।স্বামীজীর মতে চেতনার ভিন্ন ভিন্ন স্তরের ধারণা সৃষ্টি হয় উপাধি থেকে ,যার সঙ্গে চেতনা আপাতভাবে সম্পৃক্ত। এখানে উপাধি বলতে এক সীমা সৃষ্টিকারী অনুষঙ্গবিশেষকে বোঝানো হয়েছে যা অজ্ঞানের বন্ধন, যা দিয়ে আত্মা-দেহ -মন, ইন্দ্রিয় ,বুদ্ধি ও অহংকারের সঙ্গে মিশে গিয়ে নিজেকে ঢেকে ফেলে।

এ প্রসঙ্গে স্বামীজী আরো বলেন –আত্মজ্ঞান লাভ হলে সকল পদার্থে একই চেতনের প্রকাশ দেখা যায়। এই চৈতন্য সদা শুষ্ক,মুক্ত এবং অক্ষয়।আত্মজ্ঞান লাভ হলে চৈতন্যময় জীবন আলোকশ্রেষ্ঠ, সত্যশ্রেষ্ঠ আত্মার দ্বারা জ্যোতির্ময় হয়ে ওঠে। ১০

স্বামীজীর কথা থেকে জানতে পারা যায় ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্যে একটি বিশেষ মতের উপরেই জোর দেওয়া হয়। সেটি হল অদ্বৈতবাদ। এই মতবাদের উদ্ভব হয় বেদান্ত দর্শন থেকে। মনে করা হয় হিন্দু দর্শনের সকল মতবাদের উদ্ভব হল বেদান্ত বা উপনিষদ্ থেকে, কিন্তু অদ্বৈতবাদিগন বিশেষভাবে এই নামটি নিজেরা গ্রহণ করেছেন, যেহেতু তাঁরা তাঁদের সমগ্র ধর্ম ও দর্শনকে কেবলমাত্র বেদান্তের ভিত্তিতেই স্থাপন করতে চেয়েছেন ,তাই অদ্বৈতবাদকে অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক ও বিজ্ঞানসম্মত বলে স্বামী বিবেকানন্দও মনে করেন।

অদ্বৈতবাদ অনুযায়ী- যদি ঈশ্বর থাকেন ,তা হলে তিনি জগতের নিমিত্ত ও উপদান কারণ। তিনি যে কেবল স্রষ্টা তা নয়, সৃষ্টকার্যও তিনি, তিনি স্বয়ং এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। ১১

স্বামীজীর মতে অজ্ঞব্যাক্তিরা যাকে বিশ্বসংসার রূপে গ্রহণ করে, তার কোন প্রকৃত সত্তা নেই- এটাই বেদান্তের কথা ।এসবই স্বামীজীর কথায় আত্মসম্মোহন। প্রকৃতপক্ষে অনন্ত, অসীম ,নিত্যমঙ্গলময় সত্তাই একমাত্র সত্তা।এই সত্তাই আত্মা। তিনি সকল বস্তুর উর্ধ্বে। সকল জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের উর্দ্ধে। এই আত্মার মধ্যে এই আত্মার মাধ্যমেই বিশ্বকে দেখে মানুষ। তিনিই আসলে একমাত্র সত্তা, বেদান্তের ভাষায় তিনি নারীও নন, পুরুষও নন,কারণ আত্মায়

নরনারীর ভেদ নেই ।সকল বস্তু, সকল জীবই আত্মা—লিঙ্গবিহিন, শুদ্ধ চিরমঙ্গলময় আত্মা। নাম,রূপ, দেহ – এগুলি জড় ।এগুলিই সকল ভেদের স্রষ্টা। নাম ও রূপ—এই উভয় প্রকারের ভেদ যদি বর্জন করা যায় ,তাহলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক হয়ে যাবে। বেদান্তের এই চিন্তার দ্বারা আলোকিত হয়ে স্বামীজী কোথাও দুই দেখেননি ।সর্বত্র 'এক'এর দর্শন করেছেন ।তাই তিনি বলেছেন –প্রকৃতি ,ঈশ্বর বিশ্ব এসবকিছুই নেই ।একমাত্র আছে অনন্ত ,অসীমসত্তা যা থেকে নামরূপের মাধ্যমে সকল বস্তু সৃষ্টি হয়েছে।

এখন প্রশ্ন হল –এই আত্মার উপলব্ধি কি ভাবে হবে?—এর উত্তরে বলা যায় ব্যক্তি কেবল নিজেকে প্রতিবিম্বিত করতে পারে ।এইভাবে বলা যায় সেই এক নিত্য সত্তা আত্মার প্রতিবিম্বই সমগ্র বিশ্ব। জগতে ইনিই সেই এক যিনি নিম্নতম কীটপতঙ্গ থেকে উচ্চতম প্রাণীতে পর্যন্ত সর্বত্র নিজেকে প্রতিবিম্বিত করেছেন। দৈহিক, মানসিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক সকল দিক থেকে সমগ্রবিশ্ব সেই এক অখণ্ড সত্তারূপে বিরাজমান। সাধারণ মানুষ এই একসত্তাকে বিভিন্নরূপে দর্শন করে। যে ব্যাক্তি নিজেকে মানবস্তরে আবদ্ধ রাখেন তাঁর নিকট এই সত্তা জগৎরূপে প্রতিভাত হয়।যে ব্যক্তি উচ্চস্তরে আরোহণ করে, তাঁর নিকট এই সত্তা ,স্বর্গরূপে প্রতিভাত হয়। বস্তুত বিশ্বজগতে একটিই সত্তা আছে। এই সত্তার আসা, যাওয়া নেই ,জন্ম মৃত্যু নেই। যখন মানুষ নিজেকে বিশ্বের অনন্ত, অসীম সত্তার সঙ্গে এক বলে উপলব্ধি করে, তখনই জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক ও অভিন্ন বলে প্রতীয়মান হয় ,তখন সমস্ত ভেদ দূরীভূত হয়ে যায়। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তখন সেই একত্ত্বে দ্রবীভূত হয়ে যায়।

অদ্বৈতবাদ অনুযায়ী জ্ঞানের চরম কথা- এক অখণ্ড বিশ্ব যা ইন্দ্রিয়ের মধ্যে দিয়ে জড়রূপে বুদ্ধির মধ্যে দিয়ে জীবরূপে এবং আত্মার মধ্য দিয়ে ঈশ্বররূপে প্রতিভাত হয়। অদ্বৈতবাদী একথা স্বীকার করেন—জগত সত্য বস্তু একটিই আছে তাকে ব্রহ্ম বলা হয়। অন্যান্য সকল বস্তুই মায়াশক্তি দ্বারা ব্রহ্ম থেকে উদ্ভাবিত। এই দর্শন অনুসারে প্রত্যেক মানুষেরই তিনটি অংশ আছে—দেহ, অন্তঃকরণ বা মন এবং মনের পশ্চাতে আত্মা। আত্মার বাইরে অবস্থিত দেহ। আত্মার ভেতরের আবরণ মন ।এই আত্মা জড় নয়। এই আত্মা অমর ও নিরাকার। এই আত্মা অনাদিকাল থেকে আছে। আত্মা সর্বব্যাপী। এই আত্মার গতি নেই।গতি আছে প্রকৃতির। প্রকৃতির গতির প্রতিবিম্ব আত্মায় পড়ে। তখন আত্মা অজ্ঞানবশত মনেকরে যে সে নিজেই গমনাগমন করছে, প্রকৃতি নয়। আত্মা এইরূপ মনে করলে আত্মা বদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু যখন আত্মা জানতে পারে তার গতি নেই সে সর্বব্যাপী, তখন আত্মা মুক্তি লাভ করে। বদ্ধ আত্মাই জীব। সমগ্র জগৎ ব্রহ্মেই অবস্তিত ছিল। ব্রহ্ম থেকেই এই জগৎ এসেছে, আবার ব্রহ্মেই এই জগতের প্রত্যাবর্তন হবে। আত্মার ক্ষেত্রেও ঠিক তাই ।ব্রহ্ম থেকেই আত্মর নিঃসরণ আবার ব্রহ্মেই তার প্রত্যাবর্তন ।এ প্রসঙ্গে অদ্বৈতবেদান্ত দর্শনে প্রত্যেক জীবের মুক্তি লাভের কথা বলা হয়েছে ।অর্থাৎ স্বামীজীর মতে প্রত্যেক বস্তুই উচ্চ থেকে উচ্চতর অবস্থায় উন্নীত হয় ।বস্তু বলতে কি তিনি জড় দ্রব্যকে বুঝিয়েছেন?

এ প্রসঙ্গে স্বামীজীর বক্তব্য হল জড়বস্তুর বাসনা কামনা থাকতে পারেনা ,কারণ জড় বস্তুর চেতনা নেই, তাহলে জড় দ্রব্যের উন্নতির কোন সম্ভাবনা তাঁর দর্শনে অন্তত নেই। তিনি এক্ষেত্রে যাঁদের উন্নতির কথা বলেছেন ,তারা হলেন সেইসব মানুষ যারা বুঝেছেন যে তাঁদের যদি মুক্তি লাভ করতে হয়, তাহলে তাদের ব্রহ্মে প্রত্যাবর্তন

করতে হবে। এই কারণেই মানুষের সংগ্রাম উচ্চথেকে উচ্চতর অবস্থায় উন্নীত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায়। এইভাবধারায় শ্রী অরবিন্দের সঙ্গে সঙ্গতি থাকলেও জড় চেতনার অস্বীকার করে অরবিন্দ চিন্তন থেকে পৃথক হয়েছে তাঁর চিন্তন।

জড়দ্রব্যকে চেতন না বললেও আত্মাকে চেতন বলেছেন তিনি।এর পিছনে যুক্তি দিতে গিয়ে বলা যেতে পারে যাকে বিশ্ব বলা হয়, তার স্থূল জড়রূপের অন্তরালে সূক্ষতর উপাদানের একটি বিশ্ব আছে। যাকে মনন বা চিন্তা বলা যেতে পারে। তারও অন্তরালে আছে আত্মা যিনি এই সকল চিন্তাকে সম্ভব করেন। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে প্রতিটি ব্যক্তির অন্তরালে যে আত্মা তা হল প্রত্যগাত্মা বা জীবাত্মা। আর বিশ্বের অন্তরালে অবস্থিত বিশ্বের চালক, শাসক ও নিয়ামকরূপী যে আত্মা, তিনিই ঈশ্বর বা পরমাত্মা বা বিশ্বাত্মা। এক্ষেত্রে জড়পদার্থগুলি কখনো অনুভবের কর্তা হতে পারেনা, সকল প্রকার কর্মের সাক্ষী বা লক্ষ্যও হতে পারে না ।তাই তাদের চেতন বলা যায় না। কিন্তু আত্মা অনুভবের কর্তা, সকল প্রকার কর্মের সাক্ষী বা লক্ষ্য তাই আত্মা চেতন ।এই আত্মা কোন রকম উপাদানের সমবায়ে গঠিত নয়, তাই তা অখণ্ড এক, অবিনশ্বর। তাই আত্মাকে অনাদি, অনন্ত শাশ্বত বলা হয়। আত্মা আবার সর্বব্যাপী। মনের পরিবর্তনের সঙ্গে আত্মার প্রকৃতি ক্রমশ আরো শুদ্ধ হতে থাকে এবং আত্মার বিকাশও উন্নততর হয়। এ প্রসঙ্গে স্বামীজী বলেছেন –প্রকৃত পক্ষে সকল আত্মাই পবিত্র, পূর্ণ, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ কিন্তু এই আত্মা যেরকম মনের মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হয়, সেভাবেই বিকশিত হতে থাকে, অর্থাৎ মানসিক গঠনের তারতম্য অনুসারে আত্মার প্রতিফলনের তারতম্য ঘটে- এই মতটিই তাঁর কাছে গ্রহণীয়।তাই বলা যেতে পারে—মনের পরিবর্তনের সঙ্গে এক প্রকৃতিও যেন ক্রমশ আরো শুদ্ধ হতে থাকে এবং আত্মার বিকাশও উন্নততর হয়। যতদিন না মন শুদ্ধ হয়, ততদিন অন্তর্নিহিত আত্মার সব গুণ পূর্ণবিকশিত হয় না, ততদিন এরকমই ভাবে চলতে থাকে ।যখন মন পরিপূর্ণ শুদ্ধ হয়,আত্মার বিকাশ পরিপূর্ণ হয়, আত্মার মুক্তি হয়। ১২

তাহলে আত্মার লক্ষ্য কি? ভারতীয় দর্শনের প্রেক্ষাপটে বলা যায়--- আত্মার লক্ষ্য হল মুক্তি লাভ করা। বিভিন্ন বদ্ধ অবস্থার মধ্যে দিয়ে আত্মা ক্রমশ মুক্তির পথে অগ্রসর হবার জন্য সচেষ্ট। বিভিন্ন বন্ধন ছিন্ন করে আত্মা যখন নিজ পূর্ণস্বরূপ প্রকাশ করে, আত্মা তখন অন্তঃ ও বহিঃপ্রকৃতির কোন নিয়মের দ্বারা বদ্ধ হয় না। আত্মা তখন সকল নিয়ম,সকল বন্ধন ও সমগ্র প্রকৃতির ঊর্ধ্বে উঠে যায়—এইখানে পৌঁছানোই আত্মার একমাত্র লক্ষ্য। এইরকম অবস্থাকে হয়তো শ্রী অরবিন্দ দর্শনে বিশ্বাতীত চেতনার মতো করে বোঝা যেতে পারে। আত্মার বিকাশ ও মুক্তি লাভের তত্ত্বটিকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে স্বামীজি একথা স্বীকার করেছিলেন যে—উচ্চতম থেকে নিম্নতম ও অতি দুষ্টব্যক্তি পর্যন্ত, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি থেকে বিচরণশীল কীটাণু সকলেই সেই পবিত্র পূর্ণস্বরূপ, অসীম আনন্দময়সত্তা। কীটের মধ্যে আত্মার অনন্ত শক্তির স্বল্প বিকাশ,শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির মধ্যে আত্মার শক্তি সর্বাধিক বিকাশিত হয়েছে। এই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য শুধু বিকাশের তারতম্যে। মূলত আত্মা একই-- অর্থাৎ বিকাশের তারতম্যের বিচারে ক্ষুদ্র জীব থেকে শ্রেষ্ঠজীব পর্যন্ত আত্মার বিকাশ স্বীকার করলেই জড় পদার্থে আত্মার বিকাশ স্বামীজী স্বীকার করেননি। পক্ষান্তরে শ্রী অরবিন্দের দর্শনে জড়ের স্তরেও চেতনার বিকাশ পরিলক্ষিত হয়।

এখন প্রশ্ন করা যেতে পারে –আত্মার মুক্তির জন্য কে সচেষ্ট হবে? জড়ের প্রশ্নই ওঠে না, কারণ জড়ে চেতনা নেই, তাহলে জড়ের মুক্তির প্রশ্নও ওঠে না । মুক্তির জন্য সচেষ্ট হবে স্বামীজীর চিন্তনে ব্যক্তিসত্তা। স্বামীজীর মতে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে ঈশ্বর, তিনিই প্রকৃত ব্যক্তিসত্তা। মানুষ যত তাঁর দিকে অগ্রসর হবে,ততই সে নিজের মিথ্যা ব্যক্তিসত্তাকে ত্যাগ করতে পারবে। তাই বলা যেতে পারে প্রকৃত ব্যক্তিসত্তা হল ক্ষুদ্র স্বার্থের কথা না ভেবে আদর্শে পৌঁছানো। এই আদর্শে পৌঁছানোই হল কবিগুরুর ভাষায় নিষ্কাম কর্মযজ্ঞের মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্র আমি থেকে বৃহৎ আমিতে উত্তরণ, শ্রী অরবিন্দের চিন্তনে এটিই হলো মানব সত্তার দিব্যসত্তায় রূপান্তর আর স্বামীজীর চিন্তনে আত্মার সচ্চিদানন্দ স্বরূপ প্রাপ্ত হওয়া বা ব্রহ্মে প্রত্যাবর্তন করা। আত্মার প্রকৃত স্বরূপ অসীম, অনন্ত, পূর্ণতা স্বরূপত মুক্তি। তাই নিজের ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটিয়ে পূর্ণস্বরূপে প্রত্যাবর্তনই স্বামীজীর মতে ব্যক্তিসত্তার চরম ও পরম লক্ষ্য।

কিন্তু এই লক্ষ্যে পৌঁছাতে গেলে কি করতে হবে ?—যতক্ষণ ব্যক্তি বহুকে দেখেছে ততক্ষণ যে অজ্ঞানের দ্বারা আবদ্ধ। কিন্তু যে মুহূর্তে এই বহুত্বপূর্ণ- জগতের ভিতরে, এই পরিবর্তনশীল জগতের অন্তরে অবস্থিত নিত্য পুরুষকে ব্যক্তি নিজের আত্মার আত্মা বলে জানতে পারে,নিজের স্বরূপ বলে বুঝতে পারে, তিনিই মুক্ত। তিনি পূর্ণআনন্দ পূর্ণশক্তি লাভ করেছেন।কিন্তু প্রশ্ন হতে পারে –এই তত্বকে জানা যাবে কি করে? উপনিষদের চিন্তা অনুযায়ী একই অগ্নি ভুবনে প্রবিষ্ট হয়ে দাহ্যবস্তুর রূপভেদে ভিন্নভিন্ন রূপে ধারণ করে, তেমনি এক সর্বভূতের অন্তরাত্মা নানাবস্তু ভেদে সেই সেই বস্তুরূপ ধারণ করে, আবার অন্তরাত্মা এই সবকিছুর উ র্দ্ধে। সর্বত্র এই একত্ব বা এক আত্মাকে উপলব্ধি করতে হবে ।অর্থাৎ অসংখ্য বহুতে একত্বকে উপলব্ধি করতে হবে। উপনিষদেও এই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়- সেখানে বলা হয়- যিনি এক, সকলের নিয়ন্তা এবং সর্বভূতের অন্তরাত্মা ,যিনি স্বীয় এক রূপকে বহুপ্রকার করেন, তাঁকে প্রকৃত জ্ঞানীগণ নিজের মধ্যে দর্শন করেন। ১৩

'নিত্যোঽনিত্যানাং', 'চেতনশ্চেতনানাম্', এই দুই ক্ষেত্রেই স্বামীজীর বক্তব্য হল বহু অনিত্যের মধ্যে নিত্য, বহু চেতনার মধ্যে এক চেতনাকে প্রত্যক্ষ করাই প্রকৃত জ্ঞানীর লক্ষণ।– কারণ এক্ষেত্রে জ্ঞানীগণ আত্মস্বরূপ দর্শন করে। আত্মাতে ব্রহ্মদর্শনই তাই বিধেয়। শ্রী অরবিন্দ তাঁর দর্শনে বহু অনিত্যের মধ্যে এক নিত্য, এবং বহু চেতনার মধ্যে এক চেতনাকে উপলব্ধি করেছিলেন বিশ্বচেতনার স্তরে। দেখা যাক স্বামীজীর দর্শনে বিশ্বচেতনার ধারণা কিভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

স্বামীজীর চিন্তনে বেদান্তের প্রভাব সর্বত্র তিনি উক্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন বেদান্তের কাঠামোতে। স্বামীজীর মতে বেদান্ত শিক্ষা দেয় জগৎকে ব্রহ্মভাবে দর্শন করতে। যদিও একথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, অদ্বৈতবেদান্ত চিন্তনে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জগতের শুধুমাত্র ব্যাবহারিক সত্যতা আছে। পারমার্থিকক বিচারে জগতের অস্তিত্ব নেই। এই প্রসঙ্গে স্বামীজী বলতে চেয়েছেন –বেদান্ত প্রকৃতপক্ষে জগৎকে একেবারে উড়িয়ে দিতে চায় না। বেদান্তে যে চূড়ান্ত বৈরাগ্যের কথা বলা হয়েছে- তার অর্থ আত্মহত্যা নয়। বেদান্ত বৈরাগ্যের অর্থ—জগতের ব্রহ্মভাব ।অর্থাৎ জগতকে যেভাবে সাধারণ মানুষ বোঝে সেই ভাবকে পরিত্যাগ করে জগতের প্রকৃত স্বরূপে বুঝতে হবে। আর সেই প্রকৃত স্বরূপ হল জগতকে ব্রহ্মভাবে দেখা। অর্থাৎ জগৎ আসলে ব্রহ্মস্বরূপ এভাবে উপলব্ধি করা। ঈশোপনিষদের প্রথম সূত্র অনুযায়ী স্বামীজি মনে করেছিলেন জগতে যা কিছু আছে, সবই ঈশ্বরের

দ্বারা আচ্ছাদিত করে বুঝতে হবে। জগতে সকল বস্তুতে ঈশ্বর দর্শন করার চেষ্টা করতে হবে ।সাধারণ মানুষের জগতের এই প্রকৃত ব্রহ্মস্বরূপকে উপলব্ধি করতে পারে না বলেই বারবার মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে ভ্রমদশা প্রাপ্ত হয় ।কিন্তু জগতের সর্বত্র যদি ব্রহ্ম দর্শন করার চেষ্টা করা যায়, তাহলেই পারস্পরিক বিদ্বেষ বা বিপরীত ভাবের 'এক' এ সমন্বয় হবে ।

এই অনুভূতিকে শ্রী অরবিন্দ বিশ্বচেতনা দিয়ে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন, আর স্বামীজী সেইভাবকেই উপলব্ধি করতে চেয়েছেন সর্ববস্তুতে ব্রহ্মদর্শন করে। স্বামীজী বারবার তাই বলতে চেয়েছেন সবকিছুর মধ্যেই ঈশ্বর স্বরূপ উপলব্ধির চেষ্টা করলে ব্যক্তির দৃষ্টিতে পরিবর্তন আসবে। স্বামীজীর কথায় সকল মহাপুরুষই এইরকম উপলব্ধির কথা বলে। প্রকৃত সত্য বাইরে খুঁজে লাভ নেই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন বলেছিলেন অন্তর্দৃষ্টি জাগরিত করে ঐ এক সত্যকে উপলব্ধি করতে স্বামীজীও সেরূপ বলেন—সর্বত্র ঈশ্বর দর্শন করতে। এভাবে যদি সর্বত্র ঈশ্বর দর্শন হয়, তবেই প্রকৃত লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে। বেদান্ত যে মায়ার জগৎ বা ত্যাগের কথা বলা হয়, সেই ত্যাগের প্রকৃত তাৎপর্য হল সর্বত্র ঈশ্বর দর্শন করা। এইভাবে প্রত্যেক কার্যে, প্রত্যেক চিন্তায়, প্রত্যেক ভাবে ঈশ্বর দর্শন করতে পারলে কোন কর্ম বা কর্মফল ব্যক্তিকে আবদ্ধ করতে পারবে না ।ব্যক্তির সকল বাসনা তখন ঈশ্বর বুদ্ধির দ্বারা বিশুদ্ধ ভাব ধারণ করবে, ঈশ্বর স্বরূপ হয়ে যাবে, তখন আর ব্যক্তির অজ্ঞান থাকবে না ।সকল ধর্মই এই শিক্ষা দেয়– সকল বস্তুতে, সকল প্রাণীর ভেতর সর্বত্র ঈশ্বর দর্শন করতে -এই অনুভূতি জাগরিত হলে সর্বত্র একত্ব বুদ্ধি আসবে ।কিন্তু এই উপলব্ধি তো একদিনে হবে না ,এই উপলব্ধি কিভাবে হবে? এর উত্তরে স্বামীজী বলেছেন -বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভাব অনুযায়ী আত্মা সম্বন্ধে প্রথমে শুনতে হবে ,পরে আত্মা সম্পর্কে মনন অর্থাৎ চিন্তা করতে হবে, পরে ক্রমাগত আত্মার ধ্যান করতে হবে, কেন শুনতে হবে? কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত না একটা উচ্চ আদর্শ শুনতে শুনতে ব্যক্তির অন্তরে প্রবেশ না করে,মস্তিষ্কে প্রবেশ না করে,রক্তের ভিতরে প্রবেশ না করে, রক্তকণায় প্রবেশ না করে, শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ব্যপ্ত না হয়, আত্মার প্রকৃত স্বরূপের কথা ততদিন শুনতে হবে, আত্মার কথা শুনতে শুনতে হৃদয় পরিপূর্ণ হবে, তাই আত্মকথা নিয়ত স্মরণ বা চিন্তন করতে হব। ব্যক্তির মনে বিভিন্নভাব আসা যাওয়া করে। তাই তিনি বলতে চেয়েছেন বারবার বিফল হলেও সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন মানুষের একমাত্র আদর্শ –এই আদর্শকে তথা আত্মকথা নিয়ত অনুধ্যান করতে হবে। অজ্ঞানের অর্থ হল বহুত্বের ধারণা। বহুত্বের ধারণাই দুঃখের কারণ ।বেদান্ত বলে,এই প্রভেদ বাস্তবিক নেই। এই প্রভেদ প্রতিভাসিক। বস্তুর অন্তঃস্থলে আছে একত্ব ।অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা এই একত্বকে দর্শন করা যাবে। সকল পদার্থের এই একত্ব বেদান্তের একটি প্রধান বিষয়। একত্বে পৌঁছানোর অর্থ ঈশ্বরে পৌঁছানো। যে ব্যক্তি এরকম একত্বদর্শী হয়েছেন, তার আর মোহ থাকবে না, দুঃখ থাকবে না, কারণ তিনি সকল বস্তুর মধ্যে প্রকৃত সত্য অন্বেষণ করে জগতের কেন্দ্রস্বরূপ ঈশ্বরে পৌঁছেছেন। তিনি সকল বস্তুর একত্ব স্বরূপ। তিনিই অনন্তসত্তা, অনন্তজ্ঞান ও অনন্ত আনন্দ স্বরূপতা প্রাক্ত হয়েছেন। স্বামীজীর চিন্তনে যে ব্যক্তি এই পরমসুন্দর প্রকৃতির রহস্যজ্ঞাত হয়েছেন, যে ব্যক্তি প্রকৃতির সাহায্যে দৈবী প্রকৃতির চিন্তা করেন, যিনি মৃত্যু অতিক্রম করেন তিনি ঐ দৈবী প্রকৃতির সাহায্যে অমৃতত্ব লাভ করবেন। ১৪

স্বামীজীর দর্শনে পরিলক্ষিত হয় ব্যাক্তিমন ও বিশ্বমনের ধারণা। এখন প্রশ্ন হল মন বলতে তিনি কি বুঝিয়েছেন?স্বামীজীর মতে---

১। এই দেহ অপেক্ষা অনেক বেশি সূক্ষ্মতর কিছু কণা দিয়ে মন গঠিত।

২। মন গতিশীল, প্রাচীন ঋষিগণ যথার্থই বলেছেন যে, জগতে মনই সব থেকে দ্রুতগতিসম্পন্ন।

৩। মন একদিকে ব্যাপক এবং আরো ব্যপ্তি তার আছে।

৪। মনের মধ্যে আছে সৃজনশীল প্রতিভা ।

স্বামীজীর মতে মন শুধুমাত্র দেহের প্রাচীরে আবদ্ধ নয় ।তা অপরের মনের ওপরেও ক্রিয়া করতে সক্ষম। মনের মধ্যে যে অদৃষ্টপূর্ব গোপন শক্তি আছে, বিশেষ প্রক্রিয়ায় সেই সব শক্তিকে জাগিয়ে তোলা এবং মনের পরিধি বিস্তৃত করা সম্ভব।মন বলতে তিনি ব্যক্তিমনকে বুঝেছেন ,যা দেহের মধ্যে ক্রিয়াশীল।

তিনি ব্যক্তি মনের স্তরভেদ স্বীকার করেছেন। তার শুরু সাধারণ মন থেকে এবং সমাপ্তি চরম পূর্ণতাপ্রাপ্ত 'যোগী' মনে।এই দুই চরম অবস্থার মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তি ও নৈতিক উৎকার্ষতার ভিন্ন ভিন্ন মাত্রাভেদ পরিলক্ষিত হয়। এই সবস্তরেই মন ও ব্যাক্তিমনের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

ব্যাক্তিমন যখন নিজের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে তখন তাকে বিশ্বমনের ধারণার সমতুল্য বলা যেতে পারে। বিশ্বমনের অধিকারী সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। তিনি তাঁর মনকে হাজার হাজার বস্তুর বিষয়ে একইসঙ্গে ব্যাপৃত করতে পারেন। সেক্ষেত্রে এ জগতে একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরমাণুর মধ্যে কি ঘটছে, সে সম্বন্ধেও তিনি সচেতন। তাই বলা যেতে পারে, ভগবান বা ঈশ্বরের প্রতি মুহূর্তে প্রতিটি বস্তু সম্বন্ধে অবহিত থাকার ক্ষমতা আছে, আর তাই ঈশ্বরের মন হচ্ছে বিশ্বমন বা সমষ্টিমন। এক্ষেত্রে প্রশ্ন হতে পারে, যদি কেউ ভগবান বা ঈশ্বর স্বীকার না করে তিনি কি বিশ্বমনকেও অস্বীকার করবেন?এই প্রশ্নের উত্তরে স্বামীজী বিষয়টিকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে,-জাগতিক বস্তু এবং ঘটনার মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ মেনে নিয়ে তাকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হয়। মনের একটি ধর্ম হল সুশৃংখল এবং উদ্দেশ্যমূলক চিন্তারপ্রকাশ। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দিকে দৃষ্টি রাখলে দেখা যায়- মহাজাগতিক বস্তু এবং ঘটনার মধ্যে এক শৃঙ্খলা লক্ষ্য করা যায় যা এক নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাভিমুখী। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিশৃঙ্খল নয় ।এটি অতি সুশৃংখল যা এক মন দ্বারা পরিকল্পিত এবং পরিচালিত। তাই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সুনিপুণ শৃঙ্খলার পেছনে এক মন স্বীকার করতেই হয়।এই মনকে কেউ ভগবান বা ঈশ্বর না বললেও প্রকৃতি বা অন্যকোন শব্দে চিহ্নিত করতে পারে, তাতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু এটুকু স্বীকার করতেই হয় যে, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একবিশ্ব বা সমষ্টিমনের অভিব্যাক্তি, স্বামীজীর ভাষায় বেদান্ত ঐ বিশ্বমন সম্বন্ধে বলে- বিশ্বমন শুধু ধারণামাত্র নয়, এক সুনিশ্চিত উপলব্ধির বিষয়। স্বামীজি মনে করেছিলেন- জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিন অবস্থায় যা চিরস্থায়ী তা হল চেতনা ।এটি অপরিবর্তনীয়। আর পরিবর্তনশীল যে সত্তা মনে আছে তাহল চিন্তা । বেদান্ত শাস্ত্রে চেতনাকে দ্রষ্টা, জ্ঞানী ও চিন্তাকে দৃশ্য, জ্ঞেয় বলা হয়েছে। অপরিবর্তনীয় চেতনাই পরিবর্তনশীল চেতনাকেই ভাস্বর করে ।মনের এই চিরস্থায়ী উপাদান অর্থাৎ চেতনা, সমষ্টিমন ছাড়া আর কিছুই

নয়। যে ব্যাক্তি নিজেকে সমষ্টি মন রূপে উপলব্ধি করবে সে তখন স্বামীজীর মতে ব্যাক্তিমন থেকে বিশ্বমনে উন্নীত হবে।কবি গুরুর মতে সেই মুহূর্তে জীবাত্মা ও পরত্মার মধ্যে অভেদজ্ঞান হবে, আত্মার মুক্তি হবে আর শ্রী অরবিন্দের মতে ব্যাক্তিচেতনা বিশ্বচেতনায় রূপান্তরিত হবে এবং এই বিশ্বচেতনাকে পাথেয় করে ব্যাক্তি পৌঁছে যাবে বিশ্বাতীত চেতনায় যেখানে বিজ্ঞানঘন পুরুষের সন্নিধ্যে ব্যক্তিসত্তার আমূল রূপান্তর ঘটাবে ,ব্যাক্তি জীবন রূপান্তরিত হবে দিব্যজীবনে।১৫

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এই বিশ্লেণই পরিলক্ষিত হয় যে বিশ্বচেতনার ধারাণায় এই দুই মহান ব্যাক্তিত্বের চিন্তনে অনেক খানি গভীর সম্পর্ক থাকলেও শ্রী অরবিন্দের চিন্তন, স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তন থেকে অনেকখানি স্বতন্ত্র। তাঁর চিন্তনের গভীরতার তল খুঁজে পাওয়া অত সহজ নয়। স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তনে বেদান্তের ব্যাবহারিক দিকটি প্রাধান্য পাওয়ায় সাধারণ মানুষের হৃদয় স্পর্শ করতে স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তন অনেক বেশী বাস্তবসম্মত বলে মনে করা যেতে পারে।

স্বামী বিবেকানন্দের মনে করেন- সকল জীবকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করলে ব্যাক্তিমন বিশ্বমনে রূপান্তরিত হবে,তখন জগতের ব্রহ্মস্বরূপতা তথা আত্মসাক্ষাৎকার সম্ভব হবে। শ্রী অরবিন্দ, স্বামী বিবেকানন্দের মত সকল জীবকে শুধুমাত্র ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করেননি, তিনি জড় ও চেতনাকে উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু তাঁর দর্শন এই কারণে স্বতন্ত্র, যে তিনি চেতনার বিকাশের সর্বোচ্চ শিখরে উত্তীর্ণ হয়ে ,অতিমানস চেতনাকে মর্ত্যধামে অবতরণ ঘটিয়ে বিবর্তনের ধারায় দিব্যমানের আবির্ভাবের স্বপ্ন দেখেছিলেন।একইসঙ্গে সর্বোচ্চ চেতনা তথা অতিমানস চেতনাকে জড়ের স্তরে নামিয়ে এনে জড়সত্তার উত্তরণ ঘটাতে চেয়েছেন অতিমানস চেতনায়, আর এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য তিনি যে মন ও অতিমনের মধ্যবর্তী সেতুর কল্পনা করেছেন তাই তাঁর দর্শনে বিশ্বচেতনার স্থান পেয়েছে। এই বিশ্বচেতনার উপলব্ধির সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তনের অনেক খানি সঙ্গতি থাকলেও শ্রী অরবিন্দের বিশ্বচেতনা উপলব্ধির সর্বোচ্চ শিখর নয়। তাই গভীরতার নিরিখে শ্রী অরবিন্দের চিন্তনের তল খুঁজে পাওয়া সাধারণ মানুষের পক্ষে কতটা সম্ভব সেই প্রশ্ন থেকে যায়। বলা যেতে পারে স্বামীজীর চিন্তনে যে বিশ্বচেতনায় এসে উপলব্ধি থেমে গেছে ,শ্রী অরবিন্দের সৃষ্টিতে সেই বিশ্বচেতনা থেকেই শুরু হয়েছে দিব্য জীবনের অনুসন্ধান। তাই বলা যেতে পারে গবেষণা পত্রের প্রেক্ষাপটে শ্রী অরবিন্দের বিশ্বচেতনা ছাপিয়ে গেছে বিশ্বাতীত চেতনায়,কিন্তু এই বিশ্বচেতনাকে পাথেয় করে বিশ্বাতীত চৈতন্যে উত্তরণের মাধ্যমে জড় ও চেতন সত্তার আমূল রূপান্তর ঘটানো যে বাস্তবিকই সম্ভব তা উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন স্বামীজী।

সমষ্টির কল্যাণ তাঁরা উভয়েই চেয়েছিলেন কিন্তু সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য যে উপায়,তা এই দুই মনীষীর কাছেই ছিল ভিন্ন ভিন্ন। যদিও বলা যেতে পারে চিন্তনের ভিন্নতা না থাকলে তত্ত্বের সৃষ্টি কি করে হবে? তাই চিন্তনের ভিন্নতার আবশ্যকতাকে অস্বীকার করা যায় না।

এই আলোচনার উদ্দেশ্যে কখনোই এটি নয় যে এক মনীষীকে নিম্নস্থানে রেখে অন্য মনীষীকে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করা। শ্রী অরবিন্দের দর্শনের সবক্ষেত্রেই একটি সমন্বয়ী দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়। এই দুই মহান ব্যক্তিই তাঁদের নিজ নিজ চিন্তনের ক্ষেত্রে যা কিছু স্বাধীনভাবে উপলব্ধি করেছেন তাঁকে প্রকাশ করেছেন। বিশ্লেষণমূলক

আলোচনার লক্ষ্য হল সমন্বয় খোঁজা। কারণ কেউই অপূর্ণতা চায় না ।তাই সমন্বয় বা পূর্ণতার খোঁজে এই গবেষণা এই পত্রটিকে এইভাবেই উপস্থাপন করতে চায় যেখানে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের মধ্যে একত্বের উপলব্ধি সম্ভব হয়।

তথ্যসূত্রঃ

১। অনির্বাণ, *দিব্যজীবন প্রসঙ্গ,* শ্রী অরবিন্দ পাঠ মন্দির ট্রাস্ট, কলকাতা- ২০০০, পৃষ্ঠা ৪৭

২। অরবিন্দ শ্রী, *মানবজাতির ভবিষ্যৎ বিবর্তন,* শ্রী অরবিন্দ পাঠ মন্দির, কলকাতা ২০০০ পৃষ্ঠা ২৩

৩। রায় সুনীল, *শ্রী অরবিন্দের দর্শন মন্থনে,* বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় পৃষ্ঠা ৪৫

৪। রায় সুনীল, *শ্রী অরবিন্দের দর্শন মন্থনে,* বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় পৃষ্ঠা ৫০

৫। অরবিন্দ শ্রী, *যোগসমন্বয়* শ্রী অরবিন্দ আশ্রম পন্ডিচেরী,২০১৬ পৃষ্ঠা ৪৩৪

৬। অরবিন্দ শ্রী, *পৃথিবীতে অতিমানস বিকাশ,* শ্রী অরবিন্দ পাঠ মন্দির ট্রাস্ট, কলকাতা,২০১৯, পৃষ্ঠা ৬৯

৭। Sri Aurobindo, vol-2,Sri Aurobindo Birth Centenary Library, Pondicherry, 1972,p-37

স্বামী বিবেকানন্দ, *আমার ভারত অমর ভারত* রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কলকাতা,পৃষ্ঠা- ১৫৫

৮। বিবেকানন্দ স্বামী, *বাণী ও রচনা,* দশমখন্ড, উদ্বোধন কার্যালয়,কলকাতা, ২০১২, পৃষ্টা ১৬৪

৯। বিবেকানন্দ স্বামী, *বাণী ও রচনা,* উদ্বোধন কার্যালয়,কলকাতা, ২০১২, তৃতীয় খন্ড পৃষ্ঠা ২১

১০। শ্রদ্ধানন্দ স্বামী,*সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শন* উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা ২০১২, পৃষ্ঠা ১৩৩

১১। বিবেকানন্দ স্বামী,*বাণী ও রচনা* , উদ্বোধন কার্যালয়,কলকাতা, ২০১২, দ্বিতীয় খন্ড ২০১৫ পৃষ্ঠা ২৩৩

১২। তদেব পৃষ্ঠা২৫৭

১৩। তদেব পৃষ্ঠা ৩৪৩

১৪। বিবেকানন্দ স্বামী, *বাণী ও রচনা,* উদ্বোধন কার্যালয়,কলকাতা, ২০১২, তৃতীয় খন্ড পৃষ্ঠা ২৩০

১৫। শ্রদ্ধানন্দ স্বামী, *সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শন,* উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা ২০১২, পৃষ্ঠা ১৪৮

লেখক পরিচিতি:

লেখিকা শ্রীমতি সৃজনী রায় ড.বি.আর. আম্বেদকার শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত। ভারতীয় দর্শন, পাশ্চাত্য দর্শন নীতিশাস্ত্র ও সমসাময়িক দর্শন নিয়ে তিনি চর্চা করেন। দর্শন নিয়ে মৌলিক চর্চা করা ছাড়াও তিনি পছন্দ করেন দর্শনের প্রচার ও প্রসার ঘটাতে।